প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ও মোহন রাকেশের ‘আধে আধুরে’: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অরূপা চক্রবর্তী

Abstract

It is observed, after comparative discussion between the dramas ‘Abong Indrajit’ of Badal Sarkar and ‘Adhe Adhure’ of the Hindi dramatist Mohan Rakesh. In both the dramas, it was the intension to reflect mental feeling of the people. Every character represented as the social character of any kind. In the drama ‘Adhe Adhure’ it has been shown how a family was ruined caused by social, economic and psychological dilemma.

Absent of characteristic according to ‘Absurd Bad’, has been found omission of characteristics in both the dramas. They are being lead by monotonousness and usual daily life style. Death is only the way to be saved from it. Dramatist Badal Sarkar in his drama ‘Abong Indrajit’ highlighted the different thought of Bengalese towards ideological aspects and social custom and the Hindi dramatist Mohan Rakesh on the same situation expressed the dilemma of the lower & middle class families after freedom. To keep their existence, the people had to lead down words at that very moment. Division & changing of personality were mainly reflected in both the dramas.

নাটকের একটি বিশিষ্ট শ্রেণি হল অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক। বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৫) নাটকটির সঙ্গে বিখ্যাত হিন্দি নাট্যকার মোহন রাকেশের ‘আধে আধুরে’(অনুবাদ ১৯৭৮) নাটকটির তুলনা করা যায়। তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা যায় এগুলি দুই ভিন্নতর ভাষার নাট্যসৃষ্টি। নাটকের কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র নির্মাণে বৈশাদৃশ্য থাকলেও গভীরতর আর্ন্ত-বিশ্লেষণে নাটক দুটির মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে কিছু সাদৃশ্যও আছে। কাহিনিগত পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি নাটকেই রয়েছে ব্যক্তি-মনের আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে ইন্দ্রজিতের ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধান, আর ‘আধে আধুরে’ নাটকে নায়ক মহেন্দ্রনাথ ব্যক্তিমনের গভীর আত্মানুসন্ধানের দ্বারা পারিবারিক সম্পর্কের স্থিতিকে বুঝে নিতে চায়।

‘আধে আধুরে’ নাটকে সব চরিত্রই যেন অর্ধেক অসম্পূর্ণ । নাট্যকার তাদের কোন সুনির্দিষ্ট একটা নাম দিয়ে চিহ্নিত করেননি। এমনকি প্রত্যেকটি পুরুষ চরিত্রেরও নাম না ব্যবহার করে নম্বর ব্যবহার করেছেন। যদিও পরোক্ষে নাটকে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকের শ্রমিক শ্রণির মতই প্রত্যেকটি পুরুষ চরিত্রগুলি একটি সামাজিক শ্রেণি চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। এক মানুষকে দিয়ে এখানে নাট্যকার বহু মানুষের রূপচিত্রকে

অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নায়িকা সাবিত্রীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কটি এক অসম্পূর্ণ মানসিক টানাপড়েনকেই নির্দেশ করেছে। ব্যক্তি এ নাটকে বিভাজিত ব্যক্তিত্বরূপে উপস্থাপিত।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে পাত্র-পাত্রী মাসিমা, মানসী, অমল-বিমল-কমল,এবং ইন্দ্রজিৎ। সেই সঙ্গে লেখকও আছেন একজন চরিত্র হিসাবে। নির্দিষ্ট প্রচলিত ধাঁচের কোন গল্প নাটকে নেই। লেখক লিখেছেন, এক বর্ষীয়সী তাকে মাসে মাসে খাতার তাড়া দেন। মানসীও দেয়। লেখকের লেখা যে কিছুই হচ্ছেনা, এটা বোঝা যায় কারণ কোন চরিত্রকেই সে চেনে না। চারটি চরিত্র মঞ্চে ঢোকে। এরা হল – অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু ইন্দ্রাজিৎ জানায় সেই নিজের ছদ্মনাম নিয়েছে নির্মল। কারণ নিয়মের বাইরে যেতে সে রাজী নয়। এখানকার প্রত্যেকটি চরিত্র বয়স বদল করে, নিজেদের পরিচয় বদল করে এবং ভূমিকা বদল করে বারবার মঞ্চে আসে। ‘আধে আধুরে’ নাটকে নির্দিষ্ট পারিবারিক বৃত্তে কাহিনি আবর্তিত হলেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটের মাঝে একটি পরিবারের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একটি শ্রেণির মানুষের ধ্বংসের বার্তাকেই সূচিত করতে চেয়েছেন। মহেন্দ্রনাথ ও সাবিত্রী সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধি।

আমাদের আলোচ্য ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ও ‘আধে আধুরে’ দুটি নাটকের চরিত্র গুলির জীবনের অসংগত আচরণ দেখে মনে হয় জীবন নিছক একটি প্রচ্ছন্ন বস্তু। সবকিছু নিয়মের প্রাচীরে আবদ্ধ। মানুষ চেষ্টা করেও এর বাইরে কিছুই করতে পারে না। মাঝে মাঝে তাদের মনে শুভ চিন্তার অতীত বার্তা আসে কিন্তু পরক্ষণেই তা যেন মরীচিকার মত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখনই জীবনে আবার আসে সেই হতাশা, ক্লান্তি ও সেই প্রাত্যহিকতায় সৃষ্টি হয় একঘেঁয়েমি। মনে হয় মানুষ জীবনে এক অর্থহীন পথ পরিক্রমা করে। এটাই যেন তার নিয়তি।

এই দুইটি নাটককেই অ্যাবসার্ড নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যুক্তি শৃঙ্খলাহীন উদ্ভট অর্থে অ্যাবসার্ড কথাটি ব্যবহৃত হয়। পরিদৃশ্যমান জগতকে মানুষ নিজস্ব বোধ বুদ্ধির আলোয় বুঝে নিতে চায়। যখন কোন নাট্য প্রবাহে কোন ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলা খুঁজে পাওয়া যায় না,তখনই তাকে অ্যাবসার্ড আখ্যা দেওয়া যায়। অ্যাবসার্ড একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও বটে। অ্যাবসার্ডবাদী সাহিত্যিকদের মতে মানুষের জীবন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। কেননা এর কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। চারিদিকে শুধু নাস্তির শূন্যতা,অ্যাবসার্ডবাদী সাহিত্যে জগৎ ও জীবনের সেই যুক্তিহীন অসম্ভবই রূপ পায়। অ্যাবসার্ডবাদী চরিত্র তার নিজের গন্তব্যকে স্থির করতেও অনেক সময় ব্যর্থ হয়। অস্তিত্বের মূল অবস্থানকে এই অর্থহীন বিশেষের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে প্রাণান্ত চেষ্টায় সে মেতে থাকে।

অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদরা মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপতা নিয়ে চিন্তা করেছেন বলেই তাঁদের রচনায় আস্তিত্বের অসাড়তা ও অর্থহীনতার বোধ প্রকাশ পেয়েছে। অস্তিত্বের সারার্থ অন্বেষণে অ্যালব্যের কামু ও সার্ত্র অ্যাবসার্ডকে দেখিয়েছেন। একঘেয়েমিকেই কীর্কেগার্দ অস্তিত্বের মূলে নির্দেশ করেছেন। আর তারই জন্য মানুষ অনেক কিছু পেয়েও না পাওয়ার অতৃপ্তিতে ভোগে। উক্ত দুই নাটকের অনেক পাত্র-পাত্রী এই অতৃপ্তিবোধের শিকার।

দুটি নাটকের কাহিনিগত তুলনায় দেখা যায় ‘আধে আধুরে’ নাটকের কাহিনি নির্দিষ্ট পারিবারিক বৃত্তের নানান সমস্যার রূপায়ণ। কিন্তু ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে প্রচলিত কোন গল্প নেই। অমল-বিমল-কমল এবং ইন্দ্রজিতের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলির এক বিশ্লেষণাত্মক শিল্পরূপ এখানে উদ্ঘাটিত। ‘আধে আধুরে’ নাটকের নায়িকা সাবিত্রী তৎকালীন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। সে প্রচলিত স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। অর্থলাভের জন্য বিভিন্ন

পুরুষের মোহিনী হয়ে সতীত্ব বিসর্জন দিতে তার কোন দ্বিধা নেই। অ্যাবসার্ডবাদের সাহিত্যিক রূপে সার্ত্র দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এঁকেছেন। প্রথমত, শূণ্যতা ও দ্বিতীয়ত, জীবনের অর্থহীনতার ভারে আক্রান্ত মানুষের ছবি। এই শূণ্যতা আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যেও এসেছে। শূণ্যতা এসেছে ইন্দ্রজিতের মধ্যে, এসেছে মহেন্দ্রনাথ এবং সাবিত্রী ও মানসীর মধ্যে। একইভাবে আলোচ্য নাটকদ্বয়ের পাত্র-পাত্রীরা জীবনের অর্থহীনতার ভারেও আক্রান্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত যদিও ইন্দ্রজিৎ বাঁচার প্রয়াস এবং সম্মিলিত শক্তির জয়গানে নিজেকে প্রাত্যহিকতায় মিশিয়ে দিয়েছে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে সাধারণ জীবনের জয় ঘোষণাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়েছে। কারণ এর রিক্ততা, শূণ্যতা ও সমস্যার বেড়াজালে আটকে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও মানুষকে তা নিয়েই বাঁচতে হয়, কারণ নিয়মের বাঁধা অতিক্রম করার শক্তি অনেকক্ষেত্রেই মানুষের থাকে না। মহেন্দ্রনাথকেও তার সমস্যা এবং জীবনের অর্থহীনতাকেই মেনে নিতে হয়েছে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েও তার মুক্তি হয়নি, তাকে আবার সংসারের টানে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে হয়েছে। স্ত্রীর যথেচ্ছাচারও তাকে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

অ্যাবসার্ডবোধে আক্রান্ত মানুষ হঠাৎ জীবনের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, পূর্বকৃত কাজগুলি তার কাছে পণ্ডশ্রম বলে মনে হয় এবং সে অসহায়তা বোধ করে। ‘আধে আধুরে’ নাটকের নায়িকা সাবিত্রীও তার পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তার মধ্যেও অসহায়তা বোধের জন্ম নিয়েছে। সাবিত্রীও এর থেকে মুক্তি চাইছে। অর্থের নেশা তাকে স্বামীর বদলে অন্য পুরুষে আকৃষ্ট করে তুলেছে। আর এই পরিস্তিতির জন্য সে স্বামীকেই দায়ী মনে করে। সমালোচকদের মতে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নিঁখুত অ্যাবসার্ড নাটক। যদিও নাট্যকার বাদল সরকার একে অ্যাবসার্ড নাটক বলেন নি। এই নাটকে অমল-বিমল-কমল-নির্মল, মানসী, মাসিমা প্রত্যেকেই পরিবেশের ঘটনাচক্রের বিভিন্ন ব্যক্তির স্বরূপ; ইন্দ্রজিতের ব্যক্তিস্বত্তার লোপ ও সমাজতন্ত্রের তুচ্ছ অংশমাত্র হয়ে উঠাকে শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতই মানতে পারেনা । আবার তার জীবনেও সেই প্রাত্যহিকতা। ইন্দ্রজিৎ বলে –‘আমি বাজার করি, আমার বউ রান্না করে।’ সামাজিক সত্তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে ব্যক্তিসত্তা –নির্মলের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ এখানে অর্থহীন জীবনযাপন করে। প্রতীক্ষা করে মৃত্যুর। কিন্তু ‘আধে আধুরে’ নাটককে সম্পূর্ণরূপে অ্যাবসার্ড নাটকের পর্যায়ভূক্ত করা যায় না। নাট্যকার যদিও চরিত্রের নানা উদ্ভট আচরণকে প্রকাশ করেছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত সামাজিক সম্পর্ক এবং একটা অস্পষ্ট টানাপোড়েন তাদের মধ্যে থেকেই গেছে। সাবিত্রী স্বামীকে যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে পায়নি, আবার মহেন্দ্রনাথও স্ত্রীকে একান্ত ভালবাসার পাত্রীরূপে পায়নি, ভালবাসা আদায় করার কোন জোর প্রচেষ্টাও করেনি। সমস্যা নিয়েই জীবনে একঘেয়েঁমিকে সঙ্গী করে এদের জীবন চলবে। এর থেকে মুক্তি মিলবে শুধু মৃত্যুতে।

‘আধে আধুরে’ ও ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় তৎকালীন ভারত ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নগ্ন বাস্তবতা মানুষকে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মানুষকে ছিন্নমূল ও বিদ্ধস্ত করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ভারতীয়দের করে দিয়েছিল মানসিকভাবে দুর্বল এবং আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত। আর তখনই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেও দেখা দেয় চরম অর্থনৈতিক সংকট। পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি মানুষের মধ্যেকার শুভ ও কল্যাণকর মনোবৃত্তিকে নষ্ট করল। ফলে মানুষের মধ্যেও যন্ত্রের মতই একঘেঁয়েমি শুরু হল। অপেক্ষাকৃত

নিম্নমধ্যবিত্তরাও ভিখারিতে পরিণত হল। আর অন্নের জন্য বুভুক্ষু মানুষের হাহাকারকে শিল্পী সাহিত্যিকরা তাদের সৃষ্টিতে তুলে ধরলেন। এরই ফলশ্রুতিতে গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেই বাদল সরকার ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে বাঙালির নৈতিক ও সামাজিক মানসের টানাপোড়েনকে তুলে ধরলেন। হিন্দি নাট্যকার মোহন রাকেশ ‘আধে আধুরে’ নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রকে তুলে ধরলেন। অস্তিত্ব রক্ষার্থেই তখন মানুষকে এতটা নীচে নামতে হয়েছিল।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে মূখ্য চরিত্র ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার বাদল সরকার বলেছেন – ‘Who is neither a character nor prototype.’ তিন অঙ্কের এই নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা খণ্ডিত দৃশ্য কোলাজ হয়ে ধরা পরেছে। অমল-বিমল-কমল এবং ইন্দ্রজিৎ কাজ করে, খায়, ঘুমায়, মানসীকে আকাঙ্ক্ষা করে, নিয়ম মানে, ভাঙে, অর্থহীন কথা বলে, নিরুদ্দেশে চলে। লেখক জানান – ‘আমাদের পথ আছে, আমরা হাটব।’ সিসিফাস এর রূপকে জীবনে অর্থহীন ভার বহনের ক্লান্তিকে নাট্যকার এ নাটকে তুলে ধরেছেন। জীবন শূণ্যতার কথাও এখানে এসেছে। যেমন ‘এ এক অঙ্ক। আবর্তনের অঙ্ক। পুরো অঙ্কটার উত্তর শূণ্য।’ লেখক চরিত্র এখানে সূত্রধারের ভূমিকা নিয়েছে। ইন্দ্রজিতকেই তাই নির্মল নাম নিয়ে গতানুগতিকতার তালেই চলতে হয়।

দুই নাটকের চরিত্র চিত্রণে কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ বিভাজিত ব্যক্তিত্বের রূপায়ণের দিকটা উভয় নাটকেই খুব গুরুত্ব পেয়েছে। ‘আধে আধুরে’ নাটকের চারজন পুরুষ চরিত্র হল মহেন্দ্রনাথ, সিংহানিয়া, জগমোহন, জুনেজা। এই চারজন লোকের ভূমিকায় একজন লোকই অভিনয় করবে বলে নাটকের প্রথমেই নাট্যকারের অভিমত। ‘তাহলে চারজন পুরুষ সত্যিই এক ?’ ঘটনাগত পরিস্থিতি তাদের এক নয়। তবু তারা খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক – সাবিত্রীও তাদের মধ্যে কোন সম্পূর্ন মানুষকে খুঁজে পায় না। বেকারত্ব ও আর্থিকভাবে অস্বয়ম্ভরতার বলেই সাবিত্রীর কাছে মহেন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অর্থহীন। এখানে নাট্যকার তার অভিনয় কৌশল বর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিকতার পটভূমি রচনা করেছেন।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের মানসী এবং ‘আধে আধুরে’ নাটকের সাবিত্রী সম্পূর্ণই ভিন্ন। মানসী এখানে অমল-বিমল-কমল এবং ইন্দ্রজিতের সঙ্গ দেয়। মানসী এখানে একই নারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সাবিত্রীর পক্ষে এটা সম্ভব নয়। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে ইন্দ্রজিৎ ও লেখক চরিত্রদ্বয়ের মধ্যেই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তীব্র। গতানুগতিকতাকে মানতে পারেনা বলেই তারা সুদূরের পিয়াসী। তাই দেখি – ‘জানিনা কোথাও। অনেকদূরে কোথাও। কী আছে অনেকদূরে তাও জানি না। জঙ্গল মরুভূমি বরফের স্তুপ, কতগুলো পাখি।’ এ জীবন তাদের কাছে বিষণ্ণ ক্লান্ত। কলকাতার নাগরিক জীবন যন্ত্রণায় ‘কাতর মানুষকে’ এখানে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। একসময় ইন্দ্রজিতের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তীব্র হলেও শেষপর্যন্ত তা প্রমাণিত হয়ে যায়। ‘আধে অধুরে’ নাটকে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে মহেন্দ্রনাথ, সাবিত্রী এবং তাদের পরিবারের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের। মহেন্দ্রনাথের পারিবারিক সুখের স্বপ্নভঙ্গ হয়। সাবিত্রীর স্বামীর অর্থ ও ঐশ্বর্য লাভের স্বপ্নও ভঙ্গ হয়। আবার তাদের বড় মেয়ের স্বামীকে নিয়ে সুখে সংসার বাঁধার স্বপ্নও ভঙ্গ হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়েছে। নাট্যকার শেষেও কোন উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা দেখাননি। শুধু বেঁচে থাকাই তাদের একমাত্র কাজ।

এইভাবে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে ‘আধে আধুরে’ ও ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ দুটি নাটকই দুই বিখ্যাত নাট্যকারের শক্তিশালী প্রতিভার ফসল। ব্যক্তিত্বের

বিভাজন ও রূপান্তর দুই নাটকেই প্রতিফলিত। সমকালীন দুই ভারতীয় নাট্যকার কিভাবে তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণী প্রতিভার দ্বারা দুটি পৃথক শিল্প নির্মাণ করেছেন তা কেবল তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব। এ দুটি নাটকের আলোচনায় বোঝা যায় আধুনিক ভারতীয় নাটকে ব্যক্তির অন্তর-বিশ্লেষণ এবং বিভাজিত সত্তার রূপায়ণ নতুন নতুন পথ সন্ধান করছে।

গ্রন্থঋণ

সরকার বাদল, *এবং ইন্দ্রজিৎ*, বলাকা বুক এজেন্সি, নবম মুদ্রণ, জুলাই ২০০৬

অগ্রবাল প্রতিভা ও বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক (অনুবাদ), *মোহন রাকেশের আধে আধুরে*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ত, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী, ১৯৭৮

চক্রবর্তী বিপ্লব, *তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য স্বরূপ ও বৈচিত্র্য*, রূপসী বাংলা, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩

বসু সৌমিত্র, *নাট্যচর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বাশা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬

মোল্লা মোঃ কুতুবুদ্দিন, *বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিত : অভিনব অন্বেষা*, গ্রন্থ বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

মুখোপাধ্যায় তরুণ, *এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০০৭

চক্রবর্তী সুধীর, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই* (সম্পাদনা), পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা